দৈনিক খবর

তারিখ ... 14 NOV 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

প্রাথমিক শিক্ষা ও ২০০০ সালের স্বপ্ন

পান্থ

মহৎ কাজের তালিকা তৈরী করতে কষ্ট হয় না। কষ্ট হয় তা কাজে পরিণত করতে। সরকার সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন ২০০০ সালের মধ্যে সকলকে শিক্ষা দিবেন। আমাদের বর্তমান শিক্ষার হার নিয়ে জনে জনে হিসেবে তারতম্য ঘটে কিছু। তথাপি শতকরা ২৪.৫ ভাগ শিক্ষিত বলে একটা সর্বসম্মত রফা হয়েছে। রফা হয়েছে বলছি এ কারণে যে, বিশ্ব ব্যাংকের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট নিয়ে আমাদের মতভেদ আছে এ কথা বলতে নারাজ। শিক্ষিতের ওই হারটা বিশ্ব ব্যাংকের। বাকী পঁচাত্তর ভাগের শিক্ষাটা দশ বছরে দেয়া হবে কিভাবে ভাবতে গা শিউরে ওঠে।

এ নিয়ে সরকার বাহাদুরের সঙ্গে তর্কে যেতে ভয় হয়। কারণ তারা এতে বিরোধিতার গন্ধ পান। ফলে আরও তারস্বরে চিৎকার করে আমরা যে বিশ্ব নিন্দুক সে কথাটাই দেশবাসীকে সরকার বুঝানোর জন্য আরও উঠেপড়ে লাগেন।

দেশে ৪০ হাজারের মত প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের সংখ্যা ৬৮ হাজার। কেউ বলেন আরও হাজার পনেরো বেশী হতে পারে। তবে সরকার ৬৮ হাজার বলেছেন। আমরা তা মেনে নিলাম। এখন সবাইকে শিক্ষিত করার জন্য আর কিছু না হোক প্রতি গ্রামে স্কুল চাই। অন্ততঃ হাজার চল্লিশেক আরও দরকার। প্রতি গ্রামে একটি। আর বড় বড় শহরে অন্ততঃ শ' পাঁচেক করে দরকার। রাজধানীর লোকসংখ্যাই নাকি এখন ৭০ লাখ। এর মধ্যে ২০ লাখ বিদ্যালয়গামী শিশু হলে তো ৫শ'র মত স্কুল দরকার। এভাবে অন্যান্য শহরে আরও ২০০/৩০০ স্কুল দরকার। সরকার গ্রামাঞ্চলে আরও ৪০০০ স্কুল করবেন।

কারণ প্রাথমিক শিক্ষা সামনের বছর থেকে বাধ্যতামূলক করে আইন করা হয়েছে। আইনটা কড়া। আগে শিশু না পড়লে মাস্টার সাহেব বেত মারতেন আর এখন শিশু স্কুলে না গেলে অভিভাবকের শাস্তি হবে। সকলকে শিক্ষিত করার জন্য এতে সরকারের আগ্রহ প্রকাশ পায় সন্দেহ নেই। কাজটা সহজ নয়, খালি পেটে শিশুকে স্কুলে পাঠানো সহজ নয়। দারিদ্র্যসীমার নীচের পরিবারের ছেলেমেয়েকে স্কুলে নিতে হলে পরিবারের অন্ততঃ মোটা ভাত-কাপড়ের দরকার। সুতরাং গরীব পরিবার ধরে যদি কোন পরিকল্পনা নেয়া হয় তবে শিশুর বিদ্যালয়গামিতা বাস্তব করা সহজ হবে। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য হল দু'মুঠো ভাতের সংস্থান করা স্কুলগামী ছাত্রদের পিতা-মাতার। আইন করে শিক্ষাদানের অসুবিধাটা এখানে। কিন্তু সরকারের হাতে তত অর্থ নেই। সুতরাং উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার বদলে এভাবে যদি কর্মসংস্থান ও শিক্ষা এক একটি দুই পরিবার নিয়ে করা হয় তবে ২০০০ সালে সকল শিশুকে স্কুলে পাঠানো সহজ না হলেও অর্ধেকের বেশী শিশুর শিক্ষা লাভের নিশ্চয়তা মিলবে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় এদেশে শিক্ষার হার ছিল শতকরা ১৫ ভাগ। গত ৬৩ বছরে শতকরা দশ ভাগ শিক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ ৬ বছরে শতকরা একজন। এখন ১০ বছরে ৭৫ শতাংশকে শিক্ষিত করতে হলে বছরে শতকরা হার বের করতে হবে। অবশ্য বয়স্ক শিক্ষা না ধরলে সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৪০ ভাগ। তাতেও স্বস্তি নেই।

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার বড় সমস্যা হল বিদ্যমান প্রাথমিক স্কুলের কমপক্ষে শতকরা ২৫ ভাগের অবস্থা শোচনীয়। ছাত্র আছে কিন্তু স্কুল গৃহ না থাকার মত ভাঙ্গাচোরা, গাছতলায় অনেক স্কুল বসে। মেঘ হলে ছুটি। এর ওপর বছর বছর ঘূর্ণিঝড়ে অনেক স্কুলগৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার সবটা মেরামত করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া বহু স্থানে প্রাথমিক শিক্ষকের পদ খালি আছে। পূরণ করার জন্য সরকার যাদের শিক্ষক হিসেবে নির্বাচন করে নিয়োগপত্র দিয়েছেন, কোথাও অজ্ঞাত কারণে তাদের সকলকে নেয়া হয়নি। অনেককে আশা দেখিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আর নিয়োগ পেতে জনশ্রুতি আছে, বাম হাতে কিছু কোথাও নাকি গুঁজে দিতে হয়। রটনা যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে হয়, তা অস্বীকার করা যায় না। এ ছাড়া আছে প্রশাসনিক খুঁত খুঁতে স্বভাব। নিয়োগ হয় না অনেক ক্ষেত্রে এ জন্য। কিংবা নিয়োগ প্রাপ্তির পর নিয়মিত বেতন উঠানো নিয়ে দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। বর্তমান কনে দেখার মত। খুঁত ধরে কিভাবে প্রত্যাখ্যান না করা হোক, হয়রানি করারব্যবস্থা।

প্রশাসন শক্ত এবং দুর্নীতি অন্ততঃ কিছুটা কমিয়ে আনলে এসব অনিয়ম ও বাধা দূর করা কঠিন নয়। কিন্তু যাদের ওপর স্থানীয়ভাবে সরকার দায়িত্ব দেন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বলে যারা নির্বাচিত তাদের ভূমিকা সুনামের এমন কথা বলা চলে না। যারা লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, শিক্ষার উন্নতির চেয়ে তারা যদি আত্মোন্নতির প্রতি অধিকতর নজর দেন তবে সেটা গৌরবের না হোক, নিন্দিত হবে কেন। কেউ বিনা উদ্দেশ্যে টাকা খরচ করে জনসেবার পাঠ নেন না। সমাজের এই ব্যাধিটা দুরারোগ্য হয়ে উঠেছে। এখানে সরকারী বা বিরোধী দলীয় জাত-পাতের ভেদ নেই। ভেদ আছে সুযোগ গ্রহণের সুবিধা-অসুবিধার কথা। এ দিকটা ভেবে দেখা দরকার।

কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা বলা চলে হিমালয় প্রমাণ বাধা হল আর্থিক সঙ্গতির অভাব। সকলকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হলে কমপক্ষে প্রতিবছর ৪০ লাখ স্কুলগামী বয়সের ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাতে হবে। তাদের জন্য স্কুলগৃহ ও শিক্ষা উপকরণ যোগানোর মত অর্থ নেই। আমাদের সমগ্র বাজেটের সিংহভাগ তাহলে এজন্য বরাদ্দ করতে হয়। সেটা বর্তমান অবস্থায় বাস্তব নয়।

সরকারের সমালোচনায় যে কথাটা উঠে আসে তা হল শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ দ্বিতীয় স্থানে রাখার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা তথা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার এই হাল। এটা পুরো সত্য নয়। শিক্ষার জন্য ব্যয় বরাদ্দ বাড়ালে আরও কিছুটা সুবিধা হয় স্বীকার করতে বাধা নেই। কিন্তু লক্ষ্য অর্জনের জন্য তা যথেষ্ট নয়। এক কথায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ সামর্থ্যের বাইরে।

দ্বিতীয়তঃ সরকারের মানসিকতা। এটা সমালোচনা নয়, আলোচনা মাত্র। আমাদের দুর্ভাগ্য-যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসেন, তারা দাবী করেন যে, জনগণের কল্যাণের কাজটা এখন থেকেই শুরু। এর আগে কেউ কিছু করেনি। শাসন ব্যবস্থা ও সরকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধারাবাহিকতা যেভাবে চলে আসুক আসছে, তা অস্বীকার করে লাভ নেই। অতীত থেকে নিজেদের কালকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়ার মধ্যে গৌরব নেই। জনসভায় উত্তেজনার মুখে বাহবা লাভ যে কাজ দেয় না তা নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি থেকেই প্রমাণিত। এর সব কারণগুলো সরকারের আয়ত্তে নেই। কথাটা স্বীকার করার মধ্যে গৌরব হানি হয় না।

জনসভায় কেউ প্রতিবাদ করে না, হাততালি দেয়, এটা সকল দলের জনসভার ক্ষেত্রে সত্য। তা না হলে কেউ তো মিটিং-মিছিল করতে পারতো না। নিজেদের মধ্যে হুড়োহুড়িতে শেষ হত। সুতরাং সেটাই একমাত্র কাজ ঠিকমতো চলছে। তার মাপকাঠি নয়।

কিন্তু এমন কথা ভেবে তো বসে থাকা যায় না। সকলকে শিক্ষা দিতে হবে ওই মহৎ কথাটা বলার জন্য এবং কাজে পরিণত করার উদ্যোগ-আয়োজন প্রশংসারযোগ্য। কিন্তু যাদের জন্য এটা করা হচ্ছে, এটা তাদের অধিকার, তাদের প্রতি দেয়া দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুতি। সুতরাং এ নিয়ে অহঙ্কার না করে বিনয়ের সঙ্গে নিজেকে বা নিজেদের দেশবাসীর নিকট তুলে ধরার মধ্যে হয়তো উত্তেজনা থাকবে না। বা থাকবে হিসেবে তাদের উন্নতির সঙ্গে নিজেকে সঠিকভাবে যুক্ত করার আন্তরিকতার প্রমাণ।

এটা হল মানসিক দিক। বড় কাজ করে সকলের নিকট বড় ধরনের কৃতজ্ঞতা আশা করা অপেক্ষা সেই সাধারণ মানুষের কাছে নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করার মধ্যেই গৌরব আছে। আগেরটার মধ্যে দাপট আর অহঙ্কার প্রকাশ পায়।

কিন্তু এখন কাজের কথায় আসা যাক। দু'হাজার সালে সকলের জন্য শিক্ষা জাতিসংঘের একটি শ্লোগান। দরিদ্র দেশগুলো লুফে নিয়েছে এজন্য যে তাদের লক্ষ্য করে এ কথাটা বলা হয়েছে। আমরাও করবো বলে কোমরে গামছা বেঁধে নামলেই হল না। অবস্থাটা খতিয়ে দেখা দরকার। তবে কি ওই শ্লোগানটা দেব না, এই লক্ষ্য সামনে রাখবো না, অবশ্যই রাখবো। অন্ততঃ আশা করতে দোষ নেই। তবে আশার দোহাই দিয়ে যেন ফাঁকি দেয়া না হয় সেটা দেখা দরকার।

তাই লক্ষ্যটা সামনে রেখে আমাদের অবস্থাটা পর্যালোচনা করে সাধারণ মাপের কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হলে অন্ততঃ অগ্রগতি অনেকখানি হবার ষোল আনা সম্ভাবনা।

বর্তমানের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো উপযুক্ত করে গড়ে তোলা, গাছতলার ক্লাস আর মেঘ দেখলে ছুটি কিংবা বেঞ্চির অভাবে দাঁড়িয়ে ক্লাস করার মত কতগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে তার একটা সমীক্ষা এই মুহূর্তে প্রয়োজন। কোথায় অস্তিত্বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কিংবা সাইনবোর্ড সর্বস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে টাকা তোলা হচ্ছে, কোথায় শিক্ষক ও ছাত্র সংখ্যার মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে অর্থ মঞ্জুরী নেয়া হয়েছে, তার খোঁজ-খবর নিতে হবে অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অসুবিধাগুলো সর্বাগ্রে দূর করতে হবে। প্রচার সর্বস্বতা এড়ানোর জন্য ঘটা করে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় উদ্বোধন করার মতো ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানের পরিবর্তে ওই টাকায় ব্লাকবোর্ড, বেঞ্চি, চেয়ার ইত্যাদি ক্রয় করার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাকে সহজলভ্য করতে হবে। চাকচিক্যময় করার মানসিকতা বাদ দিতে হবে। যেসব প্রাথমিক স্কুল এখনও বেসরকারী আছে, তা সরকারের আওতায় আনতে হবে।

তারপর যে চার হাজার প্রাথমিক স্কুল নির্মাণের পরিকল্পনা আছে তা নির্বাচনী এলাকার দিকে চোখ না রেখে প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে স্থাপন করতে হবে। কাজটা শুধু সরকারের নয়। সকলের এ কথাটা যদি মনে-প্রাণে স্বীকৃতি দেয়া হয় তবে স্থানীয়ভাবে শিক্ষানুরাগী ও সর্বশ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মীদের শামিল করার মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে। সুনামটা কার পাতে পড়বে তাই নিয়ে কথা উঠলে মিলেমিশে কাজের সম্ভাবনা থাকে না।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায় অভিভাবকদের সহযোগিতা চাইতে হবে। আইনের বিধান করে শাস্তিদানের ব্যবস্থায় উৎসাহটা প্রকাশ পায়। উদ্দেশ্যের মহৎ দিকটা থাকে না।

কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে অর্থ নিয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা উঠেছে। বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে যদি লোকে চাকরি সংগ্রহের জন্যে হন্যে হতে পারে, তবে সেই টাকাটা দিয়ে কেন শিক্ষিত বেকার যুবক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাকা চাকরি করবে না। এই যুক্তিতে এ কথাটা উঠেছে। তাদের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতিটা ভাল। কিন্তু তারপর চালু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে চাকরি দেয়ার বিনিময়ে শিক্ষিত বেকার যুবকদের কাছ থেকে টাকা নেয়া হবে না তার নিশ্চয়তা কী? সরকারের ওপর মহল অবহিত না থাকতে পারেন, তবে প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি নেয়ার জন্য নির্বাচিত প্রার্থী খুব কম ক্ষেত্রেই নজরানা ছাড়া চাকরি পেয়েছেন। বরং সরকার স্থানীয়ভাবে অর্থদানে সক্ষম ব্যক্তিদের উদ্যোগী করে তোলার জন্য চেষ্টা চালানোর কথাটা ভাবা যায়। কিন্তু শিক্ষা ও যেখানে ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দেয়া হয়েছে, সেখানে এ ধরনের উদ্যোগ নেয়ার পেছনে যেটা সর্বপ্রথম প্রয়োজন তা দেশপ্রেম, রাজনৈতিক শ্লোগান নয়।

ওপরে যে সব কথা বলা হল, তা কোন সমালোচনা নয়। অবস্থাটা খুলে বলা হয়েছে। কোনরূপ কটাক্ষ করার মানসিকতা নিয়ে নয়। বরং এসব সমস্যা, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর চরিত্র ইত্যাদি বর্তমানে কোন্ পর্যায়ে আছে তার একটা চালচিত্র দেয়া হল। সমস্যা কোথায় কোথায়, কি কি সমস্যা এবং তার মধ্যে অর্থ যে প্রাণ ও প্রধান সমস্যা সে কথাটাই বুঝানোর চেষ্টা হয়েছে অর্থাৎ বর্তমানে চালু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে যেগুলো নড়বড়ে, জরাজীর্ণ কিংবা যার অস্তিত্ব ঝড়ে-বন্যায় প্লাবনে মুছে গিয়েছে সেগুলো ঠিক করা হোক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর কার্য-কর্ম সুষ্ঠুভাবে চালানো হোক। তাহলে সকলের জন্য না হলেও শতকরা ৫০ ভাগের মত লোক তো ২০০০ সালে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। এই সাফল্য অর্জন করতে পারলেও কম কৃতিত্ব নয়। অবশ্য লক্ষ্যটা উঁচুতে রাখা দরকার। কথায় আছে লক্ষ্য ভেদ করতে হলে কিছুটা উঁচুতে তাক করলে ক্ষতি নেই।